গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সুখের বাতাস গরিবের কুটিরে প্রবেশ করেনি

বিজেপি জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকাল পূর্ণ হতে চলেছে। তাদের শাসনে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, জনজীবনে সুখ সমৃদ্ধি এসেছে — একথা তারা ব্যাপকভাবে প্রচারও করছে। ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা বলছে ভারত এখন বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে, চারদিকে এখন সুখী সুখী ভাব। একেই বলা হচ্ছে 'ফিল গুড' অবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখে আছে কারা? আর কাদের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আজও অধরা? শুধু কি অটলবিহারী বাজপেয়ী সুখীভাবের প্রবক্তা? পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও প্রচার করে — তাদের শাসনেও জনজীবনের উন্নতি হয়েছে — 'কংগ্রেসী আমলে যেভাবে ঘাসের আটা, মাইলো খই' খেয়ে দিন কাটাতে হত — এখন সে অবস্থা নেই। এখন মানুষের খাবার জুটছে। এটা তাদের সুশাসনের ফল।

বাজপেয়ীজি যখন সুখানুভূতিতে অবগাহন করছেন ঠিক তখনই তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যাধীন এবং হিন্দুত্ববাদের 'পরীক্ষাগার' গুজরাটে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ গুজরাটে ভারুচ শহরের কাছে ভারেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা জনৈক সেলিম গুলাম হোসেন দারিদ্র্যের জ্বালা সইতে না পেরে তাঁর পাঁচ শিশুকন্যাকে নর্মদা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করেন। (সংবাদ প্রতিদিন ৭-২-০৪)। শুধু গুলাম হোসেনই নন, ঐ রাজ্যের সুরেন্দ্রনগর জেলায় জয়ন্তীভাই নাঞ্জিভাই হরিজন ঋণগ্রস্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হন। (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ১১-২-০৪)। অন্ধ্রপ্রদেশে

ছয়ের পাতায় দেখুন

চা-শ্রমিকদের মৃত্যু

মনুষ্যত্বের পচনে হয় এমন আচরণ

মানুষের মৃত্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ যে নিষ্ঠুর রঙ্গ-তামাসা করতে পারেন তা আবারও প্রমাণিত হল। উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলিতে অনাহার ও অপুষ্টিতে যখন ইতিমধ্যেই শত শত শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে এবং এখনও মৃত্যুর প্রবাহ চলছে — তখন নির্বিকল্প সমাধিস্থ মুখ্যমন্ত্রী গাত্রোত্থান করে বলে উঠলেন — অনাহারে কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেনি। শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন সাহেবও সুরে সুর মিলিয়ে বললেন — কোন শ্রমিক না খেয়ে মরেনি। মৃত্যু হয়েছে অপুষ্টিতে। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত দুই কমিশনার ডাঃ এন সি সাকসেনা ও এস আর সংকর্ষণ কোর্টের কাছে সুপারিশ করেছেন সরকারি সাহায্য না পাওয়ার জন্য বন্ধ চা-বাগানে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। এরই জবাবে সুপ্রিমকোর্টে হলফনামা দিয়ে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ সচিব নবীন প্রকাশ রাজ্য সরকারের পক্ষে জানিয়ে দিলেন, চা-বাগানে অনাহারে কারও মৃত্যু হয়নি, সুতরাং মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে '৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের ঠিক আগে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন অনাহারে মৃত্যুর কথা উঠলেই বিধানসভায় বলতেন — না খেয়ে মরেনি, হার্ট ফেল করে মারা গেছে। হার্ট ফেল না করলে কেউ মরে না, অনাহারে মরলেও শেষে হার্ট ফেল করে। তাই প্রফুল্ল সেনের জবাব নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি হত। অপুষ্টি আর অনাহারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? অর্ধাহার-অনাহার ও অখাদ্য কুখাদ্য আহারের পথ বেয়েই অপুষ্টির নিঃশব্দ প্রবেশ — একথা বোঝার জন্য কি বিরাট জ্ঞানের প্রয়োজন হয়? তথাপি বামপন্থী নামধারী সি পি এম দলের এইসব শীর্ষনেতৃত্ব না বোঝার ভান করছেন কেন? বাগান বন্ধ হওয়ার পর মৃত্যুহার যখন ২৪১ শতাংশ বেড়ে যায়, তখন একথা বুঝতে কি অসুবিধা হয় যে, কাজ না

চারের পাতায় দেখুন

২৪ ফেব্রুয়ারি

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র আহ্বান

গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্মচারী সংগঠনগুলির ডাকে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের জাতীয় কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা ভারতব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে, তা সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য ইউ টি ইউ সি - লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে সমস্ত স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে ১৯৯১ সাল থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট কিংবা বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার এবং একই ধারাপথে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিশ্বায়ন-উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের যে আর্থিক সংস্কার নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে চলেছে, তার ফলে সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষের উপর ব্যাপক আক্রমণ নেমে এসেছে। কাজ ও কাজের নিরাপত্তা বিপন্ন। ছাঁটাই-লেঅফ-লকআউট-ক্লোজারের তীব্রতা ব্যাপক। লক্ষ লক্ষ পদ বাতিল। অফিস তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভি আর এস আজ আতঙ্ক। অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করা দূরের কথা কমবেতনে কাজ করানোর জন্য ঠিকাপ্রথা, ক্যাজুয়াল প্রথা আজ ব্যাপকভাবে চালু। ডি-এ, বোনাস, পি-এফ, পেনশনের সুযোগ ক্রমাগত সঙ্কুচিত

চারের পাতায় দেখুন

হলদিয়ায় লক্ষ লক্ষ চাকরির কী হল?

সি পি এম যুবকর্মীরা ভেবে দেখুন

ডি ওয়াই এফ আই-এর কোন কর্মী বা নেতা কি ৩০ ডিসেম্বর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে 'গ্রামীণ কর্মসৃজন প্রকল্প' শীর্ষক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিচ্ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? থাকলে শুনতে পেতেন মুখ্যমন্ত্রীর উপলব্ধির কথা। বড় শিল্প দিয়ে রাজ্যের সমস্যার সমাধান হবে না। 'একটা হলদিয়া হল — তাতে কী হল? গত দুই বছরে গড়ে ২০০০ কোটি টাকা করে লগ্নি হচ্ছে। লগ্নী করেও তেমন কর্মসংস্থান হচ্ছে না।' তাঁর খেদোক্তি, 'এই তো লাফার্জ সিমেন্ট কোম্পানি বাঁকুড়ায় সিমেন্ট কারখানা করবে। ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, কতজন কাজ পাবে? ওরা জানালো ৬০ জন। উন্নত প্রযুক্তির এই তো অবস্থা।' এই উপলব্ধি কি মুখ্যমন্ত্রীর নতুন হল? তাঁরা কি জানতেন না যে আধুনিক যে কোন শিল্প মানেই উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর — যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় 'ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ' শিল্প? এখানে নামমাত্র শ্রমিকের কাজ হয়। তাও কোন সাধারণ মানের শ্রমিক নয় — দক্ষ তথা শিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ বা টেকনিসিয়ান। তাঁরা এগুলি জানতেন। জেনেও পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়েদের মিথ্যা কথা বলেছিলেন। যেমন বলে থাকেন কেন্দ্র বা অন্যান্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস, বিজেপি, জনতা বা অন্যান্য আঞ্চলিক দলের নেতারা। ''হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে এক লক্ষ বেকারের চাকরি হবে'' — এই বলে সেদিন সি

চারের পাতায় দেখুন

আমাদের সন্তানদের মুক্তি দাও

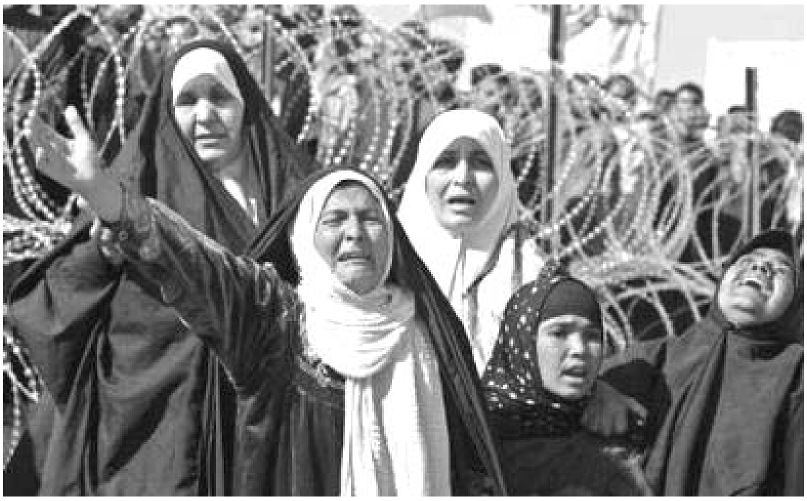

ইরাকে মার্কিন বন্দীশিবিরের সামনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ইরাকি মায়েদের কাতর আবেদন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কলকাতা জেলা সম্মেলন

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা জেলার সদস্যদের প্রতিনিধিরা ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতসভা হলে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে কলকাতা জেলা কমিটি গঠন করলেন।

উৎসাহী সদস্যদের উপস্থিতিতে হল সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছিল, বসার স্থান না পেয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনেছেন। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৪০টি আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিত্ব ছিল এই সম্মেলনে।

সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক কান্তীশ চন্দ্র মাইতি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ সুজয় বসু। সমিতির আসবে, তাদের প্রশ্ন করা উচিত — বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি ও গ্রাহকদের উপর নানা অন্যায় জোর জুলুমের বিরুদ্ধে এবং সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের স্বার্থে তারা কী ভূমিকা পালন করেছেন? এই বিচারের উপর নির্ভর করেই কাকে ভোট দেবেন সেটা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্থির করা উচিত। বাস্তবে যেসব বড় বড় দল ভোটের বাজারে লম্বা চওড়া কথা বলবে, তারা কেউই বিদ্যুৎগ্রাহকদের জন্য কিছুই করেনি। বক্তারা বলেন, রাজ্য সরকার ও শাসক দল কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে বলছে, কিন্তু বাস্তবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রে ঐ আইন পাশ হওয়ার আগেই এই রাজ্যে

রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলি এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য শিবাজী দে ও প্রদ্যুৎ চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা প্রভাত দাস ও লক্ষ্মণ সমাদ্দার এবং অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার সংঘের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি মাধব রায়।

মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন মধ্য কলকাতার ভারতী মৈত্র। সমর্থনে বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। অনেকেই বলেন, ভোটের সময় যেসব দল ও প্রার্থী ভোট চাইতে প্রয়োগ করেছে। শুধু তাই নয়, এখনও রাজ্য সরকার চাইলে সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইনের প্রয়োগ এরাজ্যে ঠেকিয়ে দিতে পারে, যেটা তারা করছে না। ফলে, তাদের মৌখিক বিরুদ্ধতা জনগণকে ঠকাতেই। এলাকায় এলাকায় গ্রাহক সমিতি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে প্রতিটি সদস্যকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বক্তারা আবেদন জানান।

সম্মেলন থেকে অধ্যাপক কান্তীশ চন্দ্র মাইতিকে সভাপতি ও সত্যেন ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ১২০ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

নদীয়া

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলন

সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নদীয়া জেলার বরেয়া-ধাওয়া পাড়া আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৯ জানুয়ারি বরেয়া পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দেশ-বিদেশের মুক্তি আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্পাদকীয় রিপোর্ট ও খসড়া প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ জালালুদ্দিন, ভরতচন্দ্র মণ্ডল, হায়াতুল রহমান, জয়দেব বর্মন, কাদের আলি, কেয়ামুদ্দিন মণ্ডল, খোসবরউদ্দিন প্রমুখ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ রাজ্য সরকারের কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতি ও খাজনা নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, কে কে এম এস-এর আন্দোলনের চাপে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বাংলা ১৩৮৫ সাল থেকে ১৪০৭ সাল পর্যন্ত সেস সহ খাজনা মকুব করতে বাধ্য হয়। সম্মেলনের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও শিক্ষায় কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের লড়াই-এর ইতিহাস তুলে ধরে বলেন — বর্তমান সমাজের সমস্ত সংকটের উৎস এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে না। কমরেড ভট্টশালী কে কে এম এস-কে এই লক্ষ্যেই আন্দোলন পরিচালনা করতে আহ্বান জানান। সম্মেলন পরিচালনা করেন কমরেড আব্দুল হামিদ। সম্মেলন থেকে কমরেডস হায়াতুল রহমানকে সভাপতি ও কেয়ামুদ্দিন মণ্ডলকে সম্পাদক করে ১৬ জনের আঞ্চলিক কমিটি ও কাউন্সিল গঠন করা হয়।

মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে

যুব সম্মেলন, বিক্ষোভ ও কনভেনশন

কলকাতা

গত ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বেহালায় সতীপ্রসন্ন বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিম বেহালা আঞ্চলিক যুব সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত যুবক-যুবতীদের সামনে জেলা ইনচার্জ কমরেড নীরেন কর্মকার সরকারের মদের ঢালাও দোকান খোলার সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক অমিয় কুমার জানা সমস্ত সামাজিক আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। মূল প্রস্তাব ছাড়াও স্বনিযুক্তির ভাঁওতা এবং মিটিং-মিছিল বন্ধ করার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের শেষে ডি ওয়াই ও'র আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি ডি ওয়াই ও লেক ইউনিটের উদ্যোগে টালিগঞ্জ চারুমার্কেটের সামনে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক যুবক সহ এলাকার বহু মানুষের উপস্থিতিতে এই কনভেনশন এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। সভায় বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক অমল রায়, সমাজসেবী সুরজিৎ চক্রবর্তী সহ ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পিন্টু প্রতিহার ও কমরেড স্বপন দেবনাথ। কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে লিখিত বক্তব্য পাঠান প্রবীণ অধ্যাপক কান্তীশ চন্দ্র মাইতি ও বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী সমর বাগচী। সভায় উপস্থিত সকল নাগরিক সরকারের সর্বনাশা নীতিকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি বড়িষা-সরশুনা ডি ওয়াই ও কমিটির উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় জনকল্যাণ গার্লস হাইস্কুলে। কনভেনশনের আহ্বান জানিয়ে এক প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করেন এলাকার ৩৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক শ্যামাপদ ঘোষ। মদের লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ও যুবজীবনের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কবি দেবাদিত্য নাগ অপসংস্কৃতির প্রসারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রধান বক্তা এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান বলেন, যুব সমাজকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যেই মাদকদ্রব্যের ঢালাও প্রসার ঘটাচ্ছে শাসকদলগুলি। তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কনভেনশন শেষে ১৮ জন সদস্যের 'মাদক ও অপসংস্কৃতি বিরোধী যুব সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি গড়িয়াতে ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে নফরচন্দ্র হাইস্কুলে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন জেলা ইনচার্জ কমরেড নীরেন কর্মকার, প্রদীপ শাসমল, পুলকেশ রায়, সন্দীপন মহাপাত্র প্রমুখ। সভায় বক্তারা রাজ্য সরকারের এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে একে প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

একই দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি সোনারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক শুভেন্দু চ্যাটার্জী। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে প্রভাস চন্দ্র দে, নাট্যকার পলাশ হালদার, অ্যাডভোকেট তরুণকান্তি হালদার, শেখর মুখার্জী, হরিপদ দাস, এ আই ডি এস ও কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জনাভ চক্রবর্তী এবং ডি ওয়াই ও'র পক্ষে পিন্টু প্রতিহার। কনভেনশনের শেষে ১৭ জনের ডি ওয়াই ও আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ

মদের লাইসেন্স ও পঞ্চায়েতি ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে, ভেঙেপড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ ও আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের দাবিতে এবং বহরমপুর শহরের মধ্যস্থল থেকে সদর হাসপাতাল স্থানান্তরকরণের প্রতিবাদে, ৯ ফেব্রুয়ারি যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে বহরমপুরে যুব বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। ঐ সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং জেলা কালেক্টরেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। তারপর ফৌজদারি কোর্টের সামনে এক সভা হয়। সভায় ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সামসুল আলম ও জেলা সভাপতি কমরেড কৌশিক চ্যাটার্জী সহ জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। সভার শেষে মদের বোতলের বিশাল প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়। অগ্নি সংযোগ করেন ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু। উপরোক্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

বহরমপুরে বিক্ষোভ। প্রতীকী মদের বোতলে আগুন দেওয়া হচ্ছে

বীরভূম

ঢালাও মদের লাইসেন্স, পঞ্চায়েতি ট্যাক্স, অশ্লীল ছবি প্রদর্শনী বন্ধ ও গ্রামীণ মজুরদের সারা বছর কাজের দাবিতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে ৩টি গ্রাম-পঞ্চায়েতের যুবকরা অংশ নেন। মূল বক্তা ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মদন ঘটক তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সাধারণ মানুষের উপর যে সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তার বিরুদ্ধে যুবকদের উন্নত চরিত্রের ভিত্তিতে সচেতন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাশেষে আরজেন সেখকে সভাপতি ও লুৎফার রহমানকে সম্পাদক করে ১৮ জনের আঞ্চলিক ডি ওয়াই ও কমিটি গঠিত হয়।

পিটার ব্লিচকে মুক্তি দেওয়া হল কাদের স্বার্থে

নির্বাচনী ডামাডোল, সরকারি টাকা খরচ করে বিজেপি'র ঢাকঢোল বাজানোর আড়ালে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই পুরুলিয়া অস্ত্রবর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পিটার ব্লিচকে ক্ষমা করে মুক্তি দিয়েছে বিজেপি সরকার। এ ধরনের অপরাধের ঘটনা, যার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত তা যেমন নজিরবিহীন, তেমনি অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার এবং আদালতে শাস্তি ঘোষণার পর কেবল ব্রিটিশ সরকারি কর্তাদের অনুরোধে আইনের বিচারকে উড়িয়ে দিয়ে এভাবে পিটার ব্লিচকে মুক্তি দেওয়াও নজিরবিহীন। অথচ দেশের বৃহত্তম বিরোধীদল কংগ্রেস প্রায় নীরবে বিষয়টি মেনে নিল। অপরাধ পশ্চিমবঙ্গে ঘটা সত্ত্বেও সি পি এমও পলিটব্যুরোর কাগুজে বিবৃতিদানের চেয়ে বেশি কিছু করল না। এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দেয়, মুখে সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা এবং দেশের নিরাপত্তার কথা বললেও বিজেপি সহ শাসকদলগুলির সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা আর বুশ-ব্লেয়ারের সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য কেবল ক্ষমতা ও ব্যাপ্তির ; চরিত্রগত পার্থক্য কিছু নেই। আসলে দুনিয়াব্যাপী কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীদের এরাই তৈরি করে, মদত দেয়, কাজে লাগায়। আবার নিজস্ব প্রয়োজন মিটলে এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সময় সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তোলে।

প্রশ্ন উঠেছে, পিটার ব্লিচকে মুক্ত করার পিছনে কি এটাই কারণ যে, সে মুখ খুললে বা এ ব্যাপারে তদন্ত এগোলে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা ভারত সরকার অসুবিধায় পড়বে? তাই কি রাষ্ট্রীয় স্তরে তাকে মুক্ত করার জন্য এত তৎপরতা? পিটার ব্লিচকে মুক্ত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের তৎপরতাও ছিল লক্ষণীয়। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রক ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ব্রিটেন থেকে অ্যাডভান্সড ট্রেনার জেট বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চালায় তখনই পিটার ব্লিচের মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে। স্বরাষ্ট্র সচিব ডেভিড ব্ল্যাঙ্কেট এ নিয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী এল কে আদবানির সঙ্গেও আলোচনা করেন। বিজেপি শেষ পর্যন্ত কেন পিটার ব্লিচকে মুক্তি দিল — কেবল ব্রিটিশ চাপই এর কারণ নাকি অন্য কোন গোপন বোঝাপড়া আছে — তা এখনও জানা যায়নি।

পিটার ব্লিচের মুক্তির সাথে সাথে দেশের সবচেয়ে বড় বেআইনি অস্ত্র চালানের মামলা, তদন্ত, সত্য উদ্‌ঘাটন চিরদিনের মতো চাপা পড়ে গেল। ১৯৯৫ সালে ১৭ই ডিসেম্বর পুরুলিয়ায় আকাশ থেকে ফেলা এই বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভার কারা পাঠাচ্ছিল, কাদের জন্য পাঠাচ্ছিল তা জানার সমস্ত সম্ভাবনা ধামাচাপা দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার নিজে। মনে রাখা দরকার, এ ধরনের অস্ত্র চালান দু-চারজন দুর্বৃত্ত বা ছোট অস্ত্রব্যবসায়ীর কর্ম নয়। উপযুক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া এত অস্ত্র কেনা, বিমান চালনার জন্য আকাশপথ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া উচ্চ প্রশাসনিক মহলের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। কাজেই বিশাল এক চক্র এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িত ছিল। এই একই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৫ জন লাতভিয়ান বিমানকর্মীকে আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমা করে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু সেই নজির পিটার ব্লিচের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ সংবাদে প্রকাশ, লাতভিয়ান বৈমানিকরা ছিল ভাড়াটে, কিন্তু পিটার ব্লিচ ষড়যন্ত্রের শিরোমণিদের একজন। এর আগেও এই যুক্তিতেই তাকে মুক্তিদানে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হয়নি। রাষ্ট্রপতিও আগে দু-বার তার ক্ষমার আবেদন খারিজ করেছেন। কিন্তু এবার তাকে নজিরবিহীনভাবে ক্ষমা করে, ক্ষমতাশালীরা যে আইন ও বিচারব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তা-ই আবার প্রমাণ করা হল।

১৯৯৫ সাল থেকে এই মামলার বিচার চলছিল কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতীয় পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার নীতিকে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করছে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীর প্রশ্নে বিজেপি বিদেশি বৃহৎ শক্তির ভূমিকা মেনে নিয়েছে। সন্ত্রাস দমনের নামে ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থন নিয়ে ভুটানের বনাঞ্চলে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। সকলেই জানেন বিশ্বের কুখ্যাত অস্ত্রব্যবসায়ীরা কংগ্রেসের মতো বিজেপিরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বোফর্স খ্যাত হিন্দুজা গোষ্ঠী কেবল রাজীবঘনিষ্ঠ ছিল তাই নয়, বাজপেয়ীজিরও তারা ব্যক্তিগত বন্ধু। কুখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী খাসোগির সঙ্গে শাসক বিজেপির দোস্তি দীর্ঘদিনের। দিল্লীর কেন্দ্রীয় দপ্তর সাউথ ব্লকে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রভাব এখন কত বেশি তেহলকা ঘুষ কেলেঙ্কারিতে তার সামান্য একটু বেরিয়ে এসেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফার্নান্ডেজের ওপর অস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রভাব নিয়ে বহুকথা চালু রয়েছে, যা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এহেন অবস্থায় পিটার ব্লিচের নজিরবিহীন রেহাই আবারও প্রমাণ করল বিজেপির সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি দেশের নিরাপত্তা, জনগণের নিরাপত্তার পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক। সন্ত্রাসদমন, সন্ত্রাসবিরোধী বুলি যাদের মুখে অহরহ শোনা যাচ্ছে, সে মার্কিন, ব্রিটেন বা ভারত যে সরকারই হোক — আসলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তাদের মাখামাখি কত দূর পিটার ব্লিচের ঘটনা আবার তা দেখালো। সাথে সাথে এও দেখালো যে দেশের নিরাপত্তার কথা বলাটা শাসক ও সংসদীয় বিরোধী দলগুলির লোকঠকানো চালাকি মাত্র।

কোক-পেপসিতে বিষ

তবুও দু'টি বহুজাতিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না

লোকসভার যৌথ সংসদীয় কমিটি তাদের রিপোর্টে কোক-পেপসিতে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে কীটনাশক থাকার কথা স্বীকার করেছে। মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা পেপসি, কোকাকোলার ১২টি ব্র্যাণ্ডের নরম পানীয়ে যে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে তা দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' ২০০৩ সালের আগস্টে প্রথম এই পানীয়গুলির নমুনা পরীক্ষা করে প্রকাশ করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের আরও কয়েকটি সংস্থাও নমুনা পরীক্ষা করে একই অভিযোগ করেছিল। তা নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল হৈ চৈ হয়। ভীত সন্ত্রস্ত অধিকাংশ মানুষই এই নরম পানীয় বর্জন করে। কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার ও রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ছিল অদ্ভুতভাবে একই সুরে বাঁধা। উভয় সরকারই এই বহুজাতিক সংস্থা দুটির বিষ পানীয় বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুণ্ঠনের কাজকে নীরবে সম্মতি জানিয়ে যাচ্ছিল এবং চেষ্টা করছিল কীভাবে এই বহুজাতিক সংস্থা দুটির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি ধামাচাপা দেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কলকাতার কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় যে, কোক ও পেপসির ১২টি নরম পানীয় 'ভারতীয় মান' অনুসারে দূষণ মুক্ত। এই রিপোর্ট দেখিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পেপসি কোকাকোলা কোম্পানিকে অভিযোগের হাত থেকে রেহাই দিয়ে দেয়।

কিন্তু এই দু'টি পানীয় নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠায়, বিশেষত সরকার ইস্যুটিকে ধামাচাপা দিতে চায় — এই অভিযোগের জবাব দিতে না পেরে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন করতে রাজি হয়। জেপিসি সম্প্রতি ১৮৪ পাতার রিপোর্ট জমা দিয়েছে সরকারের কাছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' নামে ঐ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফলাফল ঠিক ছিল এবং মাত্রার অতিরিক্ত ক্যাফেইন থাকায় শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে এই দুটি পানীয় বিপজ্জনক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ১৮৪ পাতার রিপোর্টে কোথাও এই অভিযোগে দুই বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেনি সংসদীয় কমিটি। সংসদীয় দলগুলির এই চরিত্র জানা ছিল বলেই সম্ভবত সংসদীয় কমিটি গঠন করায় বিজেপি সরকারের আপত্তি ছিল না।

এ ব্যাপারে রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ছিল দেখার মতো। ঠাণ্ডা পানীয়ের বিষ নিয়ে যখন জনমন আলোড়িত, রাজ্য সরকার ভাব দেখালো যেন কিছুই হয়নি। ইতিপূর্বে ইরাকে বর্বর মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে মার্কিন দ্রব্যের 'প্রতীকী বয়কট' হিসাবে কোকাকোলা-পেপসি বয়কট করার জন্য এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সি পি এম-এর কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির স্বার্থের কাছে নতিস্বীকার করে সি পি এম নেতৃত্ব ঐ বয়কটের ডাকে সাড়া দেয়নি। পানীয়ে বিষ পাওয়ার পর জনমতের চাপ বাড়ায় ফ্রন্ট সরকার মুখরক্ষার্থে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পাছে মাল্টিন্যাশনালরা চটে যায়, সেজন্য পরীক্ষার ফল জনসাধারণকে না জানিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তারপর অদ্ভুত নীরবতা। কোকাকোলা পেপসির প্রতি এই বদান্যতা যে আসলে বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতিই দায়বদ্ধতা, সেকথা ঠিক স্থানে জাহির করে বাহবা আদায় করতে ছাড়েন নি বুদ্ধদেববাবু। বোম্বাইয়ে শিল্পপতিদের এক সভায় সগর্বে তিনি বলেন 'আমরা কিন্তু কোক-পেপসি বয়কটে সাড়া দিইনি' অর্থাৎ বিদেশি পুঁজির মালিকরা আমাদের ঠিক ঠিক চিনুন, আমাদের প্রতি সদয় থাকুন।

জেপিসি'র রিপোর্টে পানীয় বিক্রির ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে দেশের সরকারগুলি জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার চেয়ে বহুজাতিক পুঁজির মুনাফার স্বার্থের সেবা করাকেই বড় কর্তব্য বলে মনে করে, সেদেশে সরকারের উপর ভরসা রাখলে জনগণেরই সমূহ বিপদ। অতএব জনগণকে নিজেদের দায়িত্বেই এই পানীয় দুটিকে বয়কট করতে হবে, এর প্রভাব থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে।

সংবাদ পত্রের পাতা থেকে

এক বছরে একই জায়গায় দু'বার শিলান্যাস

মাত্র এক বছরের ব্যবধানে একই জায়গায় একই পরিমাণ জমিতে শিল্পগড়ার আশ্বাস দিয়ে ভূমি পুজো করালো শিল্প সংস্থা ও হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। আগের বার শিল্পস্থাপনের আশ্বাস দিয়ে 'পলি পার্ক' গড়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সি পি এম সংসদ সদস্য ও হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ শেঠ। এবার রাশিয়ান সংস্থা উরাল ইন্ডিয়াকে নিয়ে এসে গাড়ি তৈরির কারখানা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। বুধবার হলদিয়ার দিঘাশিপুরে ৪১নং জাতীয় সড়কের পাশে ১০০ একর জমিতে ভূমিপুজো করতে হাজির ছিলেন উরাল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে কে শরাফ।

ভূমিপূজা উপলক্ষে আয়োজিত সভায় লক্ষ্মণবাবু অবশ্য পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দেন, পলি পার্কের জায়গা স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হলদিয়া পেট্রোকেমের আট নম্বর গেটের সামনে থেকে পলি পার্ক করা হবে। (বর্তমান ১২-২-০৪)

অনাহারে মৃত্যু হল দুই ডানলপ কর্মীর

অনাহারে, দুশ্চিন্তায় ফের দুই ডানলপ কর্মী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন গত ১১ ফেব্রুয়ারি। মৃত ওই দু'জন হলেন রামসকল সাহানি (৫২) এবং ভূপাল চক্রবর্তী (৪৯)।

(প্রতিদিন ১২-২-০৪)

ভোটের প্রচারে ১৬টি বিমান এবং ২০টি কপ্টার বিজেপির

স্টার প্রচারকদের জন্য ১৬টি বিমান ও ২০টি হেলিকপ্টার ভাড়া করেছে বিজেপি। মার্চের শেষ দিক থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারা দেশের কোণায় কোণায় প্রচারে নেমে পড়বেন এই তারকারা। ... বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া করার জন্য কত খরচ হবে তারও হিসেব-নিকেশ তৈরি শেষ ইতিমধ্যে। সব থেকে বেশি খরচ হবে 'গালফ্স্ট্রিম' ভাড়া করার, ঘণ্টায় দেড় লক্ষ টাকা সঙ্গে ১৫ শতাংশ কর। এরপরেই 'সেস্‌না' ঘণ্টায় ৮৫০০০ টাকা। ৬ আসনের 'ডলফিন'ও প্রতি ঘণ্টায় ৭৫০০০ টাকা ভাড়া।

(প্রতিদিন- ১১-২-০৪)

লক্‌আপে বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়ায় সর্বাত্মক বন্‌ধ

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া থানা লক্‌আপে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল বিচারাধীন বন্দী কমল শর্মার। এর প্রতিবাদে এবং দোষী পুলিশের শাস্তি ও কমলের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে এস ইউ সি আই ফাঁসিদেওয়া লোকাল কমিটির ডাকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ফাঁসিদেওয়া থানা বন্‌ধ ডাকা হয়। ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত রাঙাপানি, লেইসুপাকুড়ি, ফাঁসিদেওয়া সহ সর্বত্র সাধারণ মানুষ এই বন্‌ধে সামিল হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির একটি সিমেন্ট কোম্পানির অফিস থেকে টাকা চুরির অভিযোগে ঐ কোম্পানির নৈশপ্রহরী কমল শর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরদিন আদালত থেকে তাকে ৭ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ঐদিনই অপর এক বিচারাধীন বন্দী লক্ষ্য করেন যে কমল লক্‌আপে নেই এবং পরে তাকে হাজতের বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।

ফাঁসিদেওয়া ব্লক প্রাইমারি হেলথ্‌ সেন্টারে নিয়ে গেলে সেখানকার ডাক্তার কমলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্বাস্থ্য আধিকারিক গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু হয়েছে জানালেও, মৃতের গলায় কোনরকম ক্ষতচিহ্ন না থাকার কথা স্বীকার করেন। স্থানীয় বিডিও'র কাছে অভিযোগ জানালে তিনি সমস্ত ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন।

এলাকার মানুষের বক্তব্য, কমলের মৃত্যু সিমেন্ট ব্যবসায়ী ও পুলিশের যৌথ ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের ফল। পুলিশ কমল শর্মার মৃত্যুকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইলেও এলাকার সাধারণ মানুষ সহ মৃত কমলের মা ও বোন কেউই একথা মানতে পারছেন না, কারণ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে যেসব লক্ষণ থাকার কথা সেগুলির অনুপস্থিতি ও পুলিশের বক্তব্যে বিস্তর গরমিল রয়েছে। সাধারণ মানুষের স্থির বিশ্বাস, পুলিশের অত্যাচারের ফলেই তার মৃত্যু হয় এবং এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার গল্প বানানো হয়।

এমতাবস্থায়, এস ইউ সি আই ফাঁসিদেওয়া লোকাল কমিটি ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কমলের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করছে। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে গত ১২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফাঁসিদেওয়া থানা বন্‌ধ সফল করেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

বীরভূমে নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন

সারা ভারত ডি এস ও'র বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ১০৮তম জন্ম দিবস পালন করা হয় জেলার বিভিন্ন স্থানে। ২৮ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি লাভপুর, গঙ্গারামপুর, বোলপুর, নলহাটি, রামপুরহাট, মুরারই, বিষ্ণুপুর, সিউড়ী সহ বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন বিজয় দলুই, বিকাশ মণ্ডল প্রমুখ ডি এস ও নেতৃবৃন্দ।

সি পি এম যুবকর্মীরা ভেবে দেখুন

একের পাতার পর

পি এম এবং ডি ওয়াই এফ আই বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। রাজ্যের দেওয়ালগুলি ভরিয়ে তুলেছিল স্বপ্নের রঙিন অক্ষরে। আর এই অলীক স্বপ্ন দেখিয়েই তারা সেদিন লাখো যুবকের পদযাত্রা করেছে, তাদের দিয়ে ব্রিগেড ভরিয়েছে, নির্বাচনে জিততে তাদের কাজে লাগিয়েছে। সেদিন আমরা এই মিথ্যা প্রচারের বিরোধিতা করেছিলাম। বিষয়টিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সালের ১০ মে বিধানসভায় এস ইউ সি আই দলের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রকাশ করার দাবি জানান। সেদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল সহ ৯টি আধুনিক কারখানা স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন বেসরকারি মালিকদের সাথে যে চুক্তি করেছে তাতে এক হাজারের বেশি কর্মসংস্থান হবে না। বিধানসভার প্রশ্নোত্তরে লিখিত জবাবে একথা স্বীকার করলেও বাইরের প্রচারে এ সত্য তারা বেকার যুবকদের ও তাদের নিদ্রাহীন অভিভাবকদের বলেননি, বরং মিথ্যা বলেছেন। তারপর বহু সময় বয়ে গেছে। আজ রাজ্যের বেকার যুবকরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছে যে বামফ্রন্ট সরকার সেদিন তাদের ভাঁওতা দিয়েছিল। এবং বিষয়টি আজ যখন দিবালোকের মত পরিষ্কার, তখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বৃহৎ শিল্পে কর্মসংস্থান হবে না, কর্মসংস্থান হবে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পে। অর্থাৎ আবারও এক নতুন ভাঁওতা। কারণ, কে না জানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফলে বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল এবং দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির চাপে সর্বত্রই নাভিশ্বাস উঠছে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের। বন্ধ হয়েছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প। ছাঁটাই হচ্ছে অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যে শিল্পায়নের সাড়া পড়ে গেছে বলে যে শিল্পগুলি দেখিয়ে বামফ্রন্টের নেতারা সোরগোল তুলেছেন তা হল, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে কিছু স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা। এই স্পঞ্জ আয়রন ইতিমধ্যেই ব্যাপক দূষণ ছড়ানোর পরিণামে বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রতিটি কারখানার জন্য সরকার ২০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ ও ৬০ কোটি টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেছে। সাথে রয়েছে অন্যান্য ঢালাও সুবিধা ও শ্রমিক শোষণের অবাধ অধিকার। ২০-৩০ টাকা মাইনেতে শ্রমিকদের খাটানো হচ্ছে হাড়ভাঙা খাটুনি। এতদসত্ত্বেও এগুলিতেও কোথাও ৬০ জনের বেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়নি। তবুও মুখ্যমন্ত্রী ঝানু বুর্জোয়া নেতাদের মতোই কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট

একের পাতার পর

করা হচ্ছে। নিয়োগ বন্ধ। এক কথায় শ্রমজীবী মানুষ আজ গভীর সঙ্কটে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় যেখানে যতটুকু প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে, তাকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট-বন্‌ধ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশের বিচার-ব্যবস্থায়ও শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ও আন্দোলনবিরোধী প্রবণতা আজ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্টের ধর্মঘটের উপর নিষেধাজ্ঞা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ভূমিকার ফলে এবং সাংবিধানিক অস্পষ্টতা, ব্রিটিশ আমল থেকে চালু থাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস, কিংবা আই-এল-ও'র ৮৭, ৯৮, ১৫১নং কনভেনশন ভারত সরকার কর্তৃক রূপায়িত না করা প্রভৃতি কারণে, সুপ্রিম কোর্ট একদিকে যেমন সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দিতে পেরেছে, তেমনি এই রায় মালিকশ্রেণী ও সরকারকে নয়া আর্থিক সংস্কারের কার্যক্রম আরও আক্রমণাত্মকভাবে রূপায়িত করতে সাহায্য করবে। এই রায়ের ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত হওয়ার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারও বিপন্ন হবে। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পর ৫৬ বছর ধরে কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যের কোন সরকারই সংবিধানের ৩০৯নং ধারার নির্দেশ অনুযায়ী ভারতীয় সংসদ কিংবা রাজ্য বিধানসভাগুলিতে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য চাকরির শর্তাবলী ও অধিকার সম্পর্কিত কোন আইন প্রণয়ন করেনি, মূলত ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস চালু রেখেছে। অন্যদিকে শিল্পশ্রমিকদেরও যতটুকু সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার ছিল তাও দিনের পর দিন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে দাবি তোলা হয়েছে —

১। সরকারি কর্মচারী সহ সমস্ত স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯নং ধারায় মৌলিক অধিকার হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

২। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের উপর চাপানো ব্রিটিশ আমলের সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে কর্মচারীদের জন্য সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে আইন পাশ করতে হবে।

৩। ভারত সরকারকে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (ILO) ৮৭, ৯৮ ও ১৫১নং কনভেনশান এবং ১৫৪নং রেকমেন্ডেশন বিধিবদ্ধভাবে কার্যকর করতে হবে।

৪। বেসরকারীকরণ - কোম্পানিকরণ-ঠিকাদারীকরণ - কর্মী ও কর্মসঙ্কোচন এবং অর্জিত অধিকারহরণ সংক্রান্ত সমস্ত পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৫। সমস্ত বেকারের কাজ সুনিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট কর্মসংস্থান নীতি ও কার্যক্রম ঘোষণা করতে হবে।

৬। সমস্ত বন্ধ কলকারখানা অবিলম্বে খুলতে হবে।

মালিকশ্রেণী ও সরকারের যৌথ আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর মোকাবিলায় আজ শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে এটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, একদিনের ধর্মঘটে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হবে না কিংবা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন করেও শ্রমিকজীবনের মূল সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ, শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা হল, সরকার বদলায় কিন্তু সরকারের মালিকস্বার্থ রক্ষাকারী নীতির পরিবর্তন হয় না। এরজন্য চাই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরিচালিত লাগাতার ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন। একদিনের ধর্মঘট এই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রস্তুতিমাত্র। সংগ্রামকে ব্যাপক, সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন তাকে ধাপে ধাপে উন্নত স্তরে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্য চাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও স্তরে স্তরে সংগ্রাম কমিটি। এলাকায়-এলাকায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে ধর্মঘটের প্রচার-প্রস্তুতিতে সামিল হওয়ার সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখানো ও সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার জন্য ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন।

পরিশেষে, আগামীদিনের দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারী বন্ধুর কাছে ২৪শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়ে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মনুষ্যত্বের পচনে হয় এমন আচরণ

একের পাতার পর

থাকায় বেতন মেলেনি, খাওয়া জোটেনি! ন্যূনতম মানবিকতা ও সততা থাকলে বন্ধ বাগিচা শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ স্বীকার করতে সি পি এমের আটকাত না। কারণ, শ্রমিকদের এভাবে মৃত্যুর জন্য প্রথম দায়ী মালিকরা, যারা শ্রমিকদের রক্ত জল করা শ্রম থেকে মুনাফা লুটে এখন শ্রমিকদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় দায়ী সরকার, যাদের শাসনেই মালিকরা এটা করে যেতে পারছে। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার যদি যথার্থই শ্রমিক দরদী হত তাহলে অন্তত মৃতদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য যা যা করণীয় করত। বিভিন্ন সংগঠন সমীক্ষা চালিয়ে তথ্যের ভিত্তিতে যখন দেখাচ্ছে — মৃত মানুষের সংখ্যা কম করেও হাজারখানেক — তখন যে দল ও সরকার 'সব ঝুটা' বলে উড়িয়ে দেয়, তেমন দল শ্রমিকের কী প্রয়োজন? গদিতে থাকার জন্য বামপন্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মালিকশ্রেণীর পায়ে নিজেদের সমর্পণ না করলে কোন দল শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারে না। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়তো আবারও বলতেন, মানুষের মৃত্যু আমাকে বড় আঘাত করেনা, আঘাত করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।

মানুষ পচলে দুর্গন্ধ ছড়ায় আর মনুষ্যত্বের পচনে হয় এমনই আচরণ।

আমেরিকা-রাশিয়া দ্বন্দ্ব বাড়ছে

রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্বের মাখামাখিতে চিড় দেখা যাচ্ছিল কয়েকমাস ধরেই। সম্প্রতি সেটা প্রকট হল মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের মস্কো সফরের সময়। পাওয়েল বলেই ফেলেছেন যে, রাশিয়া যেভাবে তার প্রতিবেশী (অর্থাৎ, একদা সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত অঙ্গ রাজ্যগুলি) রাষ্ট্রগুলিতে সোজাসুজি রাশিয়ার অস্তিত্ব জাহির করতে চাইছে, এবং রাশিয়ার ধনকুবের ব্যবসায়ীদের উপর লাগাম পরাতে তৎপর হয়েছে, তাতে আমেরিকা মোটেই খুশি নয়।

রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী ইগর ইভানভ বলেছেন, রুশ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাওয়েল কয়েকটি 'কালো ছায়ার' কথা উল্লেখ করেছেন, যা দূর করার জন্য প্রয়াসী না হলে রুশ-মার্কিন সম্পর্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। রাশিয়ার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নানা বুলি আওড়ে আসল যে দুটি পয়েন্ট তিনি তুলেছেন, তা হচ্ছে, রাশিয়ার সবচেয়ে ধনী তেল ব্যবসায়ী মিখাইল খোদোরকভস্কির গ্রেপ্তার এবং পূর্বতন সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলিতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ।

রুশ নেতাদের সঙ্গে পাওয়েল যেদিন সাক্ষাৎ করেন, সেদিনই রাশিয়ার একটি দৈনিক পত্রিকা 'ইজভেসতিয়া'য় পাওয়েলের লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি রাশিয়ার আইনের শাসনের অভাব নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, রাশিয়ায় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভিত্তিটাই নেই, শাসন বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব রয়েছে, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাশিয়ায় বসে এমন ঔদ্ধত্যের সাথে রুশ শাসকদের উদ্দেশ্যে কলিন পাওয়েল-এর জ্ঞান বিতরণের সাথে মাত্র কয়েকমাস আগে জর্জ বুশের মুখে রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিনের ভূয়সী প্রশংসা আদপেই মেলেনা। গত সেপ্টেম্বরে ক্যাম্প ডেভিডে দুজনের বৈঠক শেষে জর্জ বুশ তো পুটিনকে ''গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন''-এর ''দিশারী'' বলে পিঠ চাপড়েছিলেন। ইরাকে আক্রমণ নিয়ে মার্কিন-রুশ সম্পর্কে ফাটল জোড়া দিতে বুশের এটা প্রয়োজন ছিল।

তাহলে গত চার মাসে এমন কী ঘটল, যার দ্বারা রাশিয়া সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব একেবারে উল্টে গেল? গণতন্ত্রের ঐসব কথাগুলো নিতান্তই অর্থহীন, নিছকই মার্কিন ভণ্ডামি। ১৯৯৬ সালে তদানীন্তন রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন নির্বাচনী প্রহসনের মধ্য দিয়ে জয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় বসেন। ঐ নির্বাচনে প্রচারমাধ্যমকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা সহ ব্যাপক কারচুপির যাবতীয় ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। তবুও সেই নির্বাচনকে আমেরিকা 'গণতন্ত্রের জয়' বলে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। ইয়েলৎসিনকে আবার প্রেসিডেন্টের আসনে বসানোই ছিল আমেরিকার স্বার্থে প্রয়োজন। কারণ, সোভিয়েট অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি ধ্বংসসাধনে ইয়েলৎসিনের ভূমিকা ছিল পুরোহিতের। পুটিনও যতদিন পুঁজিবাদী রাশিয়ার জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থকে মজবুত করার পথে না হেঁটেছেন, ততদিন তিনিও ছিলেন আমেরিকার নয়নমণি। এখন অবস্থা একেবারে পাল্টে গিয়েছে তা নয়। আসলে আমেরিকা-ব্রিটেনের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানে, কীভাবে নানা দেশের বুর্জোয়া সরকারগুলোর সাথে কারবার করতে হয়। বিশেষত যেসব বুর্জোয়া সরকার নিজস্ব স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায়, তাদের কখন পিঠ চাপড়াতে হয়, কখন হুমকি দিতে হয়, এসব ভালই জানে সাম্রাজ্যবাদীরা।

গত অক্টোবর মাসে যখন কর ফাঁকি ও জালিয়াতির অভিযোগে রাশিয়ার পয়লা নম্বর ধনকুবের খোদোরকভস্কিকে গ্রেপ্তার করা হয়, আমেরিকা সেই ঘটনাকে রাশিয়ার গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে নিন্দা করেছিল। যদিও আসলে তা রাশিয়ার বুকে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থেই ঘা দিয়েছিল। রাশিয়া একটি বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির জোট ওপেক-এ রাশিয়া নেই। এবং রাশিয়ায় ইতিমধ্যে তেল ব্যবসা বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন পরিকল্পনা হল, ওপেক-এর বাইরের দেশ রাশিয়াকেই তেলের বড় জোগানদারে পরিণত করা, সরকারি নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার ফলে যেটা করা সহজও হবে আমেরিকার পক্ষে। রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদনকারী সংস্থা হচ্ছে 'ইউকোস' — যার মালিক খোদোরকভস্কি।

'পুটিন তুমি অবৈতনিক শিক্ষা পেয়েছ, আমরা পাবনা কেন ?'

রাশিয়া ও ইউক্রেনে ছাত্রবিক্ষোভ

এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন রাশিয়ার সেই নব্য পুঁজিপতিদের প্রতীক, যারা সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাঙনের পর প্রায় রাতারাতি ধনকুবের হয়ে যায়। যে সোভিয়েট জনগণই ছিল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিক, সেই জনগণের সম্পদ সরাসরি চুরি করেই এরা ধনী হয়।

শিল্প, খনি, তৈলকূপ সহ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র যখন বেসরকারীকরণের জন্য খুলে দেওয়া হয়, কারা তার মালিক হল? শ্রমিক ও কৃষকরা নয়, যদিও নয়া পুঁজিবাদী ''গণতন্ত্রে'' শ্রমিক কৃষকরা সম্পদের ন্যায্য ভাগ পাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যাবতীয় কূটকৌশল ও জালিয়াতির সাহায্যে সম্পদের স্রষ্টা শ্রমিক-কৃষকদের বঞ্চিত করে গুটিকয়েক অতি ধনীরা বিশাল সম্পদের মালিক হয়ে বসে। এদের অনেকেই বিদেশ থেকে ব্যাঙ্কের মারফত শুধু শেয়ার কিনে মালিক হয়ে যায়। ইউকোস কোম্পানির শেয়ারের উপরেই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নজর ছিল বেশি।

সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদক কোম্পানি ইউকোস-এর মালিক খোদোরকভস্কি পরিকল্পনা করেছিল, তার কোম্পানির ৪০ শতাংশ শেয়ার মার্কিন কোম্পানি এক্সন মবিল ও শেভরন টেকসাকোকে বিক্রি করে দেবে। এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য জর্জ বুশ তাঁর পিতাকে পর্যন্ত রাশিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। এই লেনদেন যদি পাকা হয়ে যেত, তাহলে রাশিয়ার মোট অশোধিত তেল উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা চলে যেত পশ্চিমী কোম্পানিগুলির কব্জায়। রাশিয়ায় তেল ও গ্যাসের পাইপলাইনে এখনও বেসরকারি মালিকানায় নিষেধাজ্ঞা আছে। এটা তুলে দেওয়ার জন্যও খোদোরকভস্কি কলকাঠি নাড়ছিলেন। এটা ঘটলে রাশিয়ার সমগ্র তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারে সরাসরি প্রবেশের রাস্তা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে সম্পূর্ণ খুলে যেত। সেক্ষেত্রে রুশ তেল ব্যবসায়ী ধনকুবেরদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব খাটাবার কোনও উপায়ই রুশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হাতে থাকত না। অথচ তেলই হচ্ছে রাশিয়ার বিদেশীমুদ্রা অর্জনের প্রধান পণ্য। এজন্যই পুটিন শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

সোভিয়েট শ্রমিক রাষ্ট্র ও পরিকল্পিত অর্থনীতি যখনই ভেঙে দেওয়া হল, তখন সোভিয়েট ব্যবস্থায় শিল্পোন্নত রাশিয়ার পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজির উপনিবেশে পরিণত হওয়ার বিপদ দেখা দেয়। জনগণের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে দ্রুতগতিতে। আরও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে আশা মানুষ করেছিল, অল্পদিনেই তা চুরমার হয়ে গেল। বর্বর নগ্ন পুঁজিবাদ তাদের চাকরির নিরাপত্তা ছিনিয়ে নিল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে দিল, মেয়েদের দেহ ব্যবসা ও যুবকদের চাকরির জন্য বিদেশে যেতে বাধ্য করল এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিলামে চড়িয়ে দিল।

রাশিয়ার সম্পদ দখল করার জন্য পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি প্রথম দিকে সতর্কভাবে পা ফেললেও পরে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। গত ৩১ অক্টোবর '০৩ ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল লিখেছে, 'সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাঙনের পর এই প্রথমবার রাশিয়ায় বিদেশি পুঁজি আগমন, বহির্গমন থেকে বেশি হয়েছে'। এ অবস্থাই পুটিন সরকারকে নাড়িয়ে দিয়েছে। খোদোরকভস্কির গ্রেপ্তারের পরই স্রোত উল্টোদিকে বইতে শুরু করে দেয়। ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের মতে ''ইউকোস তদন্ত শুরু হওয়ার পর রাশিয়া থেকে ৭০০ কোটি ডলার বেরিয়ে গেছে।''

রাশিয়া ও আমেরিকার কিছু সংবাদপত্রের মতে, পুটিন সরকার আসলে এক্ষেত্রে অন্য কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী — যাদের সাথে ইউকোসের স্বার্থের সংঘাত আছে — তাদের হয়েই কাজ করছেন। এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি মূলত সেন্ট পিটার্সবার্গের এবং তেল রপ্তানির সাথে এরা যুক্ত নয়। অবশ্য এদের সাথেও মার্কিন ও ইয়োরোপীয়ান তেল কোম্পানিগুলির যথেষ্ট যোগাযোগ আছে।

জর্জ বুশের দূত হিসাবে পাওয়েল নাকি পুটিনের সাথে আলোচনায় খোদোরকভস্কির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। জবাবে পুটিন বলেছেন, কিছু করার নেই, ইউকোসের কেসটা আমেরিকার এনরন-এর মতোই। অতএব খোদোরকভস্কির আদালতে বিচার হবে। বোঝা যায়, পুটিন পুঁজিবাদী রাশিয়ায় তার নিজের জমি শক্ত করতে চাইছেন, ভোটের আগে দেশের মানুষকে দেখাতে চাইছেন যেন তিনি 'দেশের স্বার্থ' দেখছেন। এক্ষেত্রে আপাতত কিছু করা যাবেনা বুঝেই আমেরিকা পূর্বতন সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলিতে রাশিয়ার প্রভাব বাড়াবার আয়োজন আটকাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এজন্যই সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের ভাঙনের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্বদিকে ন্যাটো জোটের প্রসার ঘটানোর নীতি নিয়েছে। ন্যাটোর সদস্য করার দ্বারা পূর্বতন সোভিয়েটের কয়েকটি রাষ্ট্রকে মার্কিন সামরিক প্রভাবের মধ্যে টেনে এনেছে। রাশিয়াও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে এবং মার্কিন চেষ্টাকে ঠেকাবার রাস্তা খুঁজছে। অক্টোবরে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা নীতি পেশ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সার্গেই ইভানভ ঘোষণা করেন, 'কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট স্টেটস' (পূর্বতন ১৫টি সোভিয়েট রাষ্ট্রের ১২টিকে নিয়ে গঠিত জোট) হচ্ছে রাশিয়ার পক্ষে ''অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বলয় এবং এইসব অঞ্চলে রাশিয়ার সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে যদি কোন

ছয়ের পাতার পর

রাশিয়ার পার্লামেন্টে লাল পতাকা

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৬তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত ৭ নভেম্বর (২০০৩) যখন হাজার হাজার কমিউনিস্ট সমর্থকরা মস্কোর কেন্দ্রস্থলে স্টেট ডুমা বা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ভবনের পাশ দিয়ে মিছিল করছিল, তখন ইয়ং-কমিউনিস্ট লীগ কমসোমলের এক সদস্য আরামিন বেনেডিকটভ, ঐ ভবনের নির্মাণ কর্মীদের সহায়তা নিয়ে উঠে যান একেবারে পার্লামেণ্ট ভবনের শীর্ষে। সেখানে উড়ছিল পুঁজিবাদী রাশিয়ার ত্রিবর্ণ পতাকা। সেটি সরিয়ে আরামিন উড়িয়ে দেন কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত লাল পতাকা। মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গৌরবগাথা লিফলেট আকারে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে নীচে পথের মানুষের উপর। পথ থেকে মানুষ হাততালি দিয়ে লেনিন-স্ট্যালিনের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ঐ যুবককে অভিনন্দন জানায়।

বেশ কিছু যুবক ইতিমধ্যে পার্লামেণ্ট ভবনের ছাদে উঠে যায় এবং সমাজতন্ত্রের জয়ধ্বনি দিয়ে তারাও লিফলেট ছড়িয়ে দেয়।

কর্তব্য শেষ হতেই যুবকরা চলে যায়, পুলিশ ছুটে আসে, লাল পতাকা সরিয়ে তারা ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দেয়, কিন্তু প্রায় এক ঘন্টা সময় রুশ পার্লামেণ্টে উড়েছিল লাল পতাকা!

মস্কো থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'ভয়েস অফ্ কমিউনিস্ট' থেকে পরে আরমিনকে প্রশ্ন করা হয় — রুশ পতাকাকে অসম্মান করার অপরাধে পুলিশ কি আপনাকে খুঁজছে?

উত্তরে তিনি বলেন, 'না এখনও তেমন কিছু ঘটেনি, তবে আমি আদালতে যেতে ও যারা ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছে, তাদের অভিযুক্ত করতে পারলে খুবই খুশি হব। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গরবাচেভের মতো যারা কিছুকাল আগেও শপথ নিয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন, তার সংবিধান ও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষা করবে, পরে তারা ঠিক উল্টো কাজটা করেছে, ফলে তারা অপরাধী।

আমি তাদেরকেও অপরাধী বলব যারা রাশিয়াকে একটি মুমূর্ষু দেশে পরিণত করেছে যেখানে প্রতি বছর ৮ লক্ষ মানুষ অসহায়ভাবে মারা যায়। আমি যখন লাল পতাকা তুলছিলাম, মুক্ত নীল আকাশে সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করা সেই পতাকা রাস্তার হাজার হাজার মিছিলকারী চেয়ে দেখছিল — এই দৃশ্য আমাকে উদ্দীপ্ত ও আনন্দিত করেছে। আমি নিশ্চিত, সোভিয়েট লাল পতাকা আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের পতাকা হিসাবে ক্রেমলিনের মাথায় শীঘ্রই উড়বে। (*নর্থস্টার কম্পাস*)

ইরাক ডায়েরি

৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার পথে একটি মার্কিন সেনাচৌকিতে গেরিলা যোদ্ধারা মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালালে একজন মার্কিন সেনা নিহত এবং বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এই সেনা চৌকিটিকে মার্কিন সেনা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। (হিন্দু, ৭-২-০৪)

৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মার্কিন পরিচালনাধীন ইরাকি সেনারা একটি বাসে চেপে যখন বাগদাদের পশ্চিমদিকে যাচ্ছিল তখন বাসটির উপর গেরিলারা রকেট চালিত গ্রেনেড ছুঁড়লে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। আগুনে পুড়ে বাসের আরোহী পাঁচজন ইরাকি সেনা মারা গেছে এবং দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ৪০০ জন কর্মচারী মাস মাহিনার দাবিতে দখলদার বাহিনীর সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ইরাক দখলের পর মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক উঠিয়ে দিলে এই ৪০০ কর্মচারী ছাঁটাই হয়। এ দিনের বিক্ষোভে মার্কিন সেনাদের গুলিতে ৬ জন ইরাকি নাগরিক মারা যায়। (হিন্দু, ৮-২-০৪)

৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদ শহর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে সুওয়ারা শহরে স্থানীয় পুলিশ চৌকিতে রাখা একটি বোমা বিস্ফোরণে তিনজন ইরাকি পুলিশ নিহত ও ১১ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, গেরিলারাই পুলিশ চৌকিতে এ বোমা রেখে ছিল। (ডেকান হেরাল্ড, ৮-২-০৪)

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ৮০০ জন জাপানি সেনার একটি কনভয় কুয়েত থেকে দক্ষিণ ইরাকের সামারাতে আসার সময় রাস্তায় পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে কনভয়ের দুটি গাড়ি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দুজন জাপানি সেনা নিহত এবং ১২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (হিন্দু, ৯-২-০৪)

১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদের ২৫ মাইল দক্ষিণে ইস্কান্দারিয়া শহরে স্থানীয় একটি পুলিশ চৌকি ও আদালতের নিকটবর্তী একটি স্থানে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ৫৫ জন নিহত এবং ১২৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। হতাহতদের অধিকাংশই হচ্ছে পুলিশে নবনিযুক্ত, কাজে যোগ দিতে যাবার জন্য এরা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। এ ঘটনার পর গেরিলাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যারা দখলদারদের সহযোগিতা করবে তাদের ক্ষমা করা হবে না।

এ দিনই পশ্চিম এবং পূর্ব বাগদাদের অপর দুই ঘটনায় চারজন ইরাকি সেনা অফিসার এবং দুজন মার্কিন সেনা গুলিতে মারা গেছে। (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ও হিন্দু ১১-২-০৪)

ইরাকে প্রতিরোধ অব্যাহত

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ সকালে বাগদাদ শহরের এক সেনা নিয়োগ কেন্দ্রের সামনে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছে ৪৭ জন ইরাকি। এরা যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে মার্কিন পরিচালনাধীন ইরাকি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে এসেছিল। যেখানে বিস্ফোরণ ঘটে সে স্থানটির অবস্থান 'গ্রিনজোন' বলে চিহ্নিত সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে এবং ঘটনাস্থলের খুব কাছেই হচ্ছে ইরাকে মার্কিন প্রশাসনের সদর দপ্তর। (এ পি, হিন্দু, ১২-২-০৪)

দুই মার্কিন ফৌজি নিহত

১১ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে নটা নাগাদ পশ্চিম বাগদাদের একটি এলাকায় মার্কিন সাঁজোয়া গাড়ির ওপর বোমা বিস্ফোরণে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ফার্স্ট আর্মার্ড ডিভিশনের মুখপাত্র বলেছেন আহত সেনাকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সে-ও মারা যায়।

(আজাদ হিন্দ ১৪-২-০৪)

অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন মার্কিন জেনারেল জন আবিজায়েদ

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদের পশ্চিমে ফালুজা শহরে ইরাকের বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর পরিদর্শনে যান মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাপ্রধান জেনারেল জন আবিজায়েদ। জেনারেল এবং তাঁর সঙ্গীরা সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্র একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, পরপর আরো দুটি বিস্ফোরণ হয়। মার্কিন সেনারা রাইফেল এবং মেসিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। গেরিলা যোদ্ধারা রকেট চালিত তিনটি গ্রেনেড মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে এবং অপর একজন নিকটবর্তী মসজিদ থেকে মার্কিন সেনাদের তাক করে গুলি চালাতে থাকে। গুলির লড়াই বন্ধ হয়ে যাবার পর জেনারেল আবিজায়েদ ও তার সঙ্গীরা পায়ে হেঁটে শহর পরিক্রমা করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে নিকটবর্তী মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড, উপ প্রতিরক্ষা সচিব পল ওলফোভিৎজ এবং ব্রিটিশ বিদেশ সচিব জ্যাক স্ট্র প্রমুখও গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য বেঁচেছেন। ইরাকে পা দিলেই মৃত্যু এদের ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। (এ পি, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৩-২-০৪)

১৩ ফেব্রুয়ারি বাগদাদ শহরে বোমা বিস্ফোরণে একজন মার্কিন সেনা নিহত ও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। কারবালা শহরে পোলিশ সেনাদের এক চৌকিতে রকেট চালিত গ্রেনেড ছোঁড়ায় ২ জন পোলিশ সেনা নিহত হয়। (হেড লাইন চ্যানেল)

আমেরিকা-রাশিয়া দ্বন্দ্ব বাড়ছে

পাঁচের পাতার পর

কারণে আঘাত লাগে, তবে প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে সামরিক শক্তি ব্যবহার করার অধিকার রাশিয়ার আছে।'' আমেরিকার কাছে এটা প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার পর্যায়ে পড়ে, কারণ পূর্বতন সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে আমেরিকার সামগ্রিক পরিকল্পনা রাশিয়াকে জানানোর পরপরই এই ঘোষণা করা হয়।

নভেম্বরে সেই সংঘর্ষের সূচনাও হয়ে গেছে। জর্জিয়ায় প্রেসিডেন্ট শেভার্দনাদজেকে তাড়িয়ে যেভাবে আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক আইনজীবীকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হল, তাতে আমেরিকার হাত স্পষ্ট। এবার মস্কো যাওয়ার আগেই কলিন পাওয়েল জর্জিয়া যান, নতুন প্রেসিডেন্ট মিখাইল শাকাসভিলি'র অভিষেকে অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, জর্জিয়া থেকে রুশ সৈন্য তুলে নেওয়ার যে দাবি নতুন প্রেসিডেন্ট তুলেছেন, পাওয়েল তা সমর্থনও করেন। রাশিয়াকে এড়িয়ে কাসপিয়ান উপসাগর থেকে তেল নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় করে যে পাইপলাইন আমেরিকা বসাচ্ছে, সেই পথের কেন্দ্রস্থলে আছে জর্জিয়া।

মস্কোতে এসে পাওয়েলও দাবি করেছেন যাতে জর্জিয়া ও মলডোভা থেকে রাশিয়া সৈন্য তুলে নেয়। জর্জিয়ার সঙ্গে মলডোভাকেও যুক্ত করে দিয়ে আমেরিকা বুঝিয়ে দিল তাদের দৃষ্টি ঐ পূর্বতন সোভিয়েট রাষ্ট্রটির উপরও আছে। রুশ নেতারা ঐ দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, জর্জিয়ার সঙ্গে আলোচনা হতে পারে, তবে রুশ সেনাঘাঁটি সরাবার প্রশ্নই নেই। উল্টে জর্জিয়ায় যেভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাদের রেখে দেওয়া হয়েছে, সেটাও রাশিয়ার কাম্য নয়। রুশ নেতারা পাওয়েলকে একথাও বলেছেন যে, উজবেকিস্তান ও কিরঘিজস্তানে মার্কিন সৈন্য রাখতে রাশিয়া সম্মতি দিয়েছিল আফগানিস্তানে অভিযান চালাবার জন্যই। কিন্তু সেই অভিযান শেষ হওয়ার পরও এখন আমেরিকা মধ্য এশিয়ায় সামরিক উপস্থিতিকে স্থায়ী করে ফেলছে। রাশিয়ার আরও অভিযোগ হল, মলডোভা ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যে চুক্তি হয়েছিল, তাকেও বানচাল করে দিয়েছে আমেরিকাই, যাতে এই অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব আটকে দেওয়া যায়।

এভাবেই পূর্বতন সোভিয়েট অঞ্চলগুলিতে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই নিজ নিজ প্রভাব ও আধিপত্যের প্রসার ঘটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। পাওয়েল মস্কো ত্যাগ করার একদিন পরেই রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দুই দশকের মধ্যে সর্ববৃহৎ সামরিক মহড়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। এই যুদ্ধ মহড়ায় ভূপৃষ্ঠ থেকে, সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজ থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সহ সর্বাত্মক পারমাণবিক সংঘর্ষের নকল মহড়া দেওয়া হবে — যা হবে রাশিয়ার পুনরুজ্জীবিত সামরিক শক্তির প্রদর্শনী।

মস্কো থেকে পাওয়েল ফেরার সময় দু পক্ষই একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন, রুশ-মার্কিন নিবিড় বন্ধুত্বের ধ্বজা উড়িয়েছেন, কিন্তু তলায় তলায় যে স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়েছে, তা এতই গভীর যে, নিছক করমর্দন দিয়ে তা দূর হবেনা। (তথ্যসূত্র ঃ দি হিন্দু এবং ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা)

বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে স্বদেশে প্রবল ধিক্কার

সম্প্রতি এক গণসমীক্ষায় ৫৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বুশ প্রশাসনের ইরাক নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছে। চার সপ্তাহ আগে বিরোধিতার হার ছিল ৩৬ শতাংশ।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা পরিচালিত এক সমীক্ষায় ৫১ শতাংশ ব্রিটেনবাসী জানিয়েছে ''কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে টনি ব্লেয়ারের উচিত হবে স্বীয় পদে ইস্তফা দেওয়া।'' (সাপ্তাহিক টাইম, ১৬-২-০৪)

কুটিরে প্রবেশ করেনি

একের পাতার পর

ফসলের দাম না পেয়ে বহু কৃষক আত্মহত্যা করছে। পশ্চিমবঙ্গেও কোচবিহার জেলার দিনহাটায় ফসলের দাম না পেয়ে কৃষক রামেশ্বর বর্মনের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা, বারাসতের বন্ধ হওয়া স্পিনিং মিলের তিন শ্রমিকের ক্ষিদের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা বা উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা বাগানগুলিতে অনাহারে অপুষ্টিতে শত শত শ্রমিকের অকাল মৃত্যু — এসব কোন কিছুই আজ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে আসীন নেতা-মন্ত্রীদের হৃদয়কে এতটুকু ব্যথিত করে না। দেশে এখন সুখের সুবাতাস বইছে বলে যে প্রচারটা তাঁরা করেন — সেই সুবাতাস দরিদ্রের পর্ণকুটিরে প্রবেশ করে না, বয়ে যায় অনেক উপর দিয়ে।

সুখ-সমৃদ্ধি বোঝাতে রীতিমত কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে বাজপেয়ী সরকার। কিছু সাজানো তথ্যের ভিত্তিতে তারা দেখাচ্ছে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে গ্রামের মানুষের আয় বেড়েছে। এর দ্বারা তারা দেখাতে চায় জনজীবনে যেন বিশ্বায়নের সুফল ফলতে শুরু করেছে। পরিসংখ্যানগত বিকৃতি ঘটিয়ে এবং ভুলভাবে উপস্থাপনা করে কাগজে-কলমে জনগণের আর্থিক সমৃদ্ধি দেখানো গেলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনে বেকারি, দারিদ্র্যই বেড়েছে।

দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভিজিৎ সেন সম্প্রতি জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তৈরি করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৯০ সালে গৃহীত তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহের উদার অর্থনীতি, যেটা বাজপেয়ী সরকার আরও দ্রুত ও আরও উদারভাবে রূপায়িত করছে, তার দ্বারা দেশবাসীর কোন্ অংশ লাভবান হয়েছে আর কোন্ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যারা ভারতের সব থেকে ধনী, ভোগ বা ব্যয়ের প্রশ্নে সব থেকে চমকপ্রদ উন্নতি হয়েছে তাদেরই — অর্থাৎ শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে সব থেকে ধনী ২০ শতাংশের। ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে তাঁদের মাথাপিছু ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। এছাড়া গ্রামীণ জনসংখ্যার উপরের দিকের ২০ শতাংশ — অর্থাৎ যারা গ্রামীণ ধনী সম্প্রদায়, তাদের মাথাপিছু ব্যয় বেড়েছে ২০ শতাংশ। শহরাঞ্চলের সবচেয়ে ধনী সম্প্রদায়ের পরে যে ৪০ শতাংশ মানুষ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও মাথাপিছু ব্যয়বৃদ্ধির হার একই অর্থাৎ ২০ শতাংশ। শহরের অবশিষ্ট ৪০ শতাংশের মাথাপিছু ব্যয় খুব একটা বাড়েনি। তবে সবথেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফুটে উঠেছে গ্রামীণ জনসংখ্যার একেবারে গরিব ৮০ শতাংশের ক্ষেত্রে। ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে তাদের মাথাপিছু ব্যয় কমে গেছে। অর্থাৎ আয় কমে গেছে। (তথ্যসূত্র ঃ অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষের প্রবন্ধ)

তাহলে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী যে আলো ঝলমলে ভারতের কথা বলেন, সেখানে কাদের বাস? নিশ্চয়ই দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের নয়।

''কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬-৯৭ থেকে শুরু করে ২০০১-২০০২ পর্যন্ত ছটি আর্থিক বছরে দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট ৮ লক্ষ পদে চাকরির সুযোগ কমেছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সাহিব সিং ভার্মা যে হিসাব দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র ২০০১-০২ আর্থিক বছরেই সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ কমেছে ৪ লক্ষ ২০ হাজার।'' (বর্তমান ৫-১-০৪)। এই হল শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনে উদারীকরণ-বিশ্বায়নের ফল। বিশ্বায়নের সুফল বলে যা প্রচার করা হয় তা গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে।

মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ শূন্যগর্ভ ও হীন ষড়যন্ত্রমূলক

সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের ঘোষণা

[কটকে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে (২৮-১-০৪) মহিলা আসন সংরক্ষণ বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।]

২৮-৩০ জানুয়ারি ২০০৪, কটক শহরে অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন'-এর ২য় সর্বভারতীয় সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, বেশিরভাগ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল, যারা একদা ক্ষমতায় ছিল বা বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যাদের কারোরই এদেশের মহিলাদের অবস্থার দ্রুত অবনমনের বিষয়ে কোন মাথাব্যথাই ছিল না এবং মহিলাদের ওপর ক্রমাগত বেড়ে চলা শোষণ-জুলুম-আক্রমণ কঠোর হাতে বন্ধ করার কোনও চেষ্টাই যারা করেনি, সেই দলগুলিই হঠাৎ লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়ে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছে।

এই সম্মেলন আরো লক্ষ্য করছে যে, যখন মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সমস্ত মানুষ নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকার হয়ে অসহনীয় জীবন-যাপন করছে, যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যা অন্য সকল স্বাধীনতার উৎস, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে এদেশের মহিলারা দ্রুত নিঃস্ব হয়ে পড়ছে, যখন কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও তারা মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, যখন মহিলারা চরমতম উৎপীড়ন ও শোষণের শিকার হচ্ছে, যখন মহিলাদের এই অসহায়, করুণ, হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করা হচ্ছে না, ঠিক তখনই মহিলা-আসন সংরক্ষণের জন্য পুঁজিবাদের সেবাদাস এইসব দলগুলি উদ্যোগী হয়েছে।

গভীর বেদনার সাথে এই সম্মেলন আরো লক্ষ্য করছে যে, মহিলা আসন সংরক্ষণের এইসব সমর্থকরা এমন সময়ে তাদের দাবি তুলছে যখন শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সুপরিকল্পিত নীতির ফলে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতাই নয়, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতাও বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে এবং সেই অর্থে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে — যে রাষ্ট্র দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহু কষ্টে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি এমনভাবে কেড়ে নিচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষের ওপর একের পর এক আক্রমণ, যা তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন অধিকারই সাধারণ মানুষের না থাকে।

এই সম্মেলন আরও লক্ষ্য করছে যে, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব তোলা হচ্ছে এমন একটা সময়ে, যখন শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের তল্পিবাহক রাজনৈতিক দলগুলির চাতুরি ও চক্রান্তের ফলে সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই, যখন শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর পছন্দের রাজনৈতিক দলগুলি নির্লজ্জভাবে পেশীশক্তি, অর্থবল ও প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে জনপ্রতিনিধি বেছে নেবার নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নিছক ধোঁকাবাজিতে পরিণত করেছে। নির্বাচনের ফলাফল আজ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী ও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলি, এরাই যৌথভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বাইরে ঠেলে দিয়ে। একথা সকলেই জানেন যে, এই পরিস্থিতিতে জনগণের সত্যিকারের একজন প্রতিনিধিকেও নির্বাচিত করা প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর সংরক্ষিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে মনে করে, উল্লেখিত মহিলা-আসন সংরক্ষণের নীতি যদি রূপায়ণও করা হয়, তাতেও নিপীড়িত মহিলা সমাজের কোনও একজন প্রকৃত প্রতিনিধিই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবেন না। ফলে এই সম্মেলন মনে করে, তাদের জীবনের প্রকৃত সমস্যা থেকে মহিলাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার এ এক সুচতুর পরিকল্পনা, উৎপীড়ন-আক্রমণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে যে মহিলা আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তাতে ভাঙন ধরানোরও এ এক অপচেষ্টা এবং একই সাথে এভাবে আসন সংরক্ষণের দ্বারা সমাজের ধনীদের মধ্য থেকে কিছু মহিলাকে নির্বাচনে জেতানোর রাস্তা তৈরি করাও এর উদ্দেশ্য, যারা শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করবে।

এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সকল দিক থেকে পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার যাবতীয় সামর্থ্য মহিলাদের মধ্যে রয়েছে এবং আজকের মহিলা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহিলাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে সকল বাধাবিঘ্ন দূর করতে বুর্জোয়া সরকারগুলিকে বাধ্য করা। এই দৃঢ় অভিমতের উপর দাঁড়িয়েই এই সম্মেলন মনে করে যে, মহিলাদের জন্য তথাকথিত আসন সংরক্ষণ করার যে উদ্যোগ বুর্জোয়া দলগুলি নিয়েছে, তার পিছনকার মতলব হচ্ছে মহিলাদের হীনাবস্থাকেই চিরস্থায়ী করা এবং মহিলাদের চরম পশ্চাদপদ অবস্থার জন্য যেসব কারণগুলি দায়ী, তা দূর করার পরিবর্তে, সেই পশ্চাদপদতাকেই অজুহাত করে মহিলাদের সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী রূপে গণ্য করা। অত্যন্ত ক্ষোভ ও ঘৃণার সাথে বলতে হয় যে, বুর্জোয়া দলগুলির এই মতলবে সি পি আই (এম) - সি পি আইও সাথী হয়েছে। এই সম্মেলন সংরক্ষণের প্রবক্তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করছে এবং তাদের এই মনোভাবকে নারীর মর্যাদার প্রতি অপমান বলেই গণ্য করছে।

এই সম্মেলনের দৃঢ় অভিমত হল, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার অনুগত রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সঠিক রাস্তায় নারীমুক্তির সংগ্রাম গড়ে ওঠার পথে বাধা দেওয়া যায়, যাতে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সম্মিলিত সংগ্রামে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়।

রাষ্ট্র ও সমাজে মহিলাদের যথাযথ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ন্যায্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার, নারীর সমস্ত দিক থেকে পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার পথে সকল বাধা শক্তিশালী আন্দোলনের চাপে দূর করার এবং সংসদে ও সংসদের বাইরের আন্দোলনগুলিতে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার শপথ নিয়ে এই সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন — মহিলা আসন সংরক্ষণের শূন্যগর্ভ ও হীন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের মুখোশ খুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই চালানোর, সঠিক লাইনে বিকাশমান নারীমুক্তির সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য নিপীড়িত নারীসমাজকে ধোঁকা দেওয়ার যে ছক কষা হচ্ছে, তাকে ব্যর্থ করার এবং দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারের দ্বারা সংরক্ষণ নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা ও মোহ তৈরি করা হয়েছে, আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় তার থেকেও মহিলাদের মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করছে।

বাঁকুড়ায় রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা চর্চার অঙ্গ হিসাবে একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া শহরের রবীন্দ্রভবনে। ৭, ৮, ৯ ফেব্রুয়ারি '০৪ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার ১৩২২ এস ইউ সি আই কর্মী সংগঠক এই শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাশিবিরের সূচনায় দলের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী দার্শনিক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য, পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নির্মল মণ্ডল। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

তিনদিনের এই শিক্ষা শিবিরে কমরেড প্রভাস ঘোষ, দর্শনের বিভিন্ন দিক, ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদী দর্শনের মৌলিক পার্থক্য, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় এবং হাতে গড়া এদেশের মাটিতে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠালগ্নে কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস, সোভিয়েট রাশিয়ায় পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তন, এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে-বিদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, এদেশের গণআন্দোলনে দলের ভূমিকা, পার্টি কর্মীদের দায়িত্ব, পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনগুলির শক্তিবৃদ্ধি করতে দলের কর্মী-সংগঠকদের উদ্যোগ ও জীবন সংগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাঞ্জল ও বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই শিক্ষাশিবির কর্মী সংগঠকদের গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ৯ ফেব্রুয়ারি দুপুরে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিন দিনের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির শেষ হয়।

মঞ্চে রাজ্য নেতৃবৃন্দ (বাঁদিক থেকে) কমরেডস্ মানব বেরা, রতন মুখার্জী, সৌমেন বসু, প্রভাস ঘোষ, গোপাল কুণ্ডু ও নির্মল মন্ডল

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

লুণ্ঠন ও ব্যাভিচারের মরূদ্যান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়ায় বিয়েবাড়ির বাসে ডাকাতির ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী আবারও যেভাবে রাজ্যকে শান্তি-শৃঙ্খলার মরূদ্যান বলেছেন, তার প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন—

''এ রাজ্যে ছিনতাই-ডাকাতি-লুঠ, গণধর্ষণ, খুন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় যখন মুখ্যমন্ত্রীর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, তখন তিনি গর্বিত কণ্ঠে রাজ্যকে আইন শৃঙ্খলার 'মরূদ্যান' বলে পুনরায় দাবি করে এক নিষ্ঠুর পরিহাসই করলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যও অন্যান্য রাজ্যের মতই সমাজবিরোধীদের অবাধ লুণ্ঠন ও ব্যাভিচারের মরূদ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে। গদীসর্বস্ব দলগুলির ক্রিমিন্যালভিত্তিক রাজনীতিই এর জন্য দায়ী।''

এমন নির্বাচনে গরিবের প্রার্থীর স্থান কোথায়?

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে কথিত ভারতবর্ষে নির্বাচন নামক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি যে এখন পুরোপুরি চাঁদির জোরে চলে, এটা আমরা বহুদিন ধরেই বলছি। জনসাধারণও এটা আঁচ করতে পারেন নানা দলের নির্বাচনী প্রচার ও ব্যবস্থাপনার জৌলুস দেখে। এবার নির্বাচন কমিশনও, একেবারে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, ভোটে এখন টাকা ওড়ে। 'সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ' নামক সংস্থার একটি শাখা 'লোকনীতি'কে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত করেছিল ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে ভিত্তি করে এ ব্যাপারে সমীক্ষা করার জন্য। তার রিপোর্টও লোকনীতি জমা দিয়েছিল ২০০২ সালে। কিন্তু এতদিন নির্বাচন কমিশন এই রিপোর্ট নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি, বরং রিপোর্টকে গোপনই রাখা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি কর্তারা এ নিয়ে মুখ খুলেছেন, বন্ধ আলমারি থেকে সমীক্ষা রিপোর্টটি বেরও করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রার্থী পিছু ব্যয়ের সীমা বেঁধে দিয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা, যেটা এবার ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আইনতই নির্বাচনে একটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন প্রার্থী ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারবেন।

লোকনীতির রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, '৯৯ সালের নির্বাচনে যেসব প্রার্থী ১৬.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন, তাঁরা মাথাপিছু গড়ে খরচ করেছিলেন ৭৩.৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ব্যয়সীমার চার গুণেরও বেশি। দেশের মোট ৫৪৫টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতে, এমন ভোটপাওয়া প্রার্থীর সংখ্যা ৪ জন ধরে নিলে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৩৫ কোটি টাকা। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আরও ৮০০ কোটি টাকা, যেটা নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকার খরচ করেছিল '৯৯ সালে।

রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, খরচের যে হিসাব প্রার্থীরা দেখিয়েছে, তা নিতান্তই খাতায় কলমে লিখিত হিসাব। যার বাইরে রয়েছে বহু গোপন ও অলিখিত খরচ। যেমন, ভোট পাওয়ার জন্য ভোটদাতা ও দালালদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেওয়া বহু উপঢৌকন, বিরোধী দলের প্রার্থীদের ভোট কাটার জন্য দাঁড় করানো ভুয়া প্রার্থীদের দেওয়া উৎকোচ, এমনকি নির্বাচনে লড়ার টিকিট পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দলকে টাকা দেওয়া ইত্যাদির জন্য খরচ হওয়া বিপুল অর্থ লোকনীতি তার হিসাবের বাইরে রেখেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, যারা ৪ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশের মত ভোট পেয়েছে, তাদেরও এক একজন প্রার্থীর গড় খরচের পরিমাণ ৩৫.৬ লক্ষ টাকা। আগেই বলা হয়েছে যারা ১৬.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তাদের মাথাপিছু গড় ব্যয় ছিল ৭৩.৬ লক্ষ টাকা। এই রিপোর্টের খবর পাওয়ার পর তেমন হৈচৈ যে হল না, তার কারণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা জানেন, খরচের এই সংখ্যাও নস্যি, বাস্তবে কেন্দ্র পিছু কয়েক কোটি টাকা দলগুলো খরচ করে !

নির্বাচনের অর্থ যদি হয় জনগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া, সেখানে এই বিপুল পরিমাণ টাকার প্রয়োজন কোথায়? গণতন্ত্রে নিজের গ্রহণযোগ্যতা ভোটারদের কাছে বুঝিয়ে বলতে ভোটপ্রার্থীদের এই শত শত কোটি টাকা ব্যয় করারও সঙ্গত কোনও কারণ নেই। তাহলে প্রতিটি নির্বাচনে কেন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়?

আসলে নির্বাচন এখন পরিণত হয়েছে টাকার খেলায়। যে প্রার্থীর টাকার জোর যত বেশি, নির্বাচনে জয়লাভ করার সম্ভাবনাও তাঁর তত বেশি। নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা ও সমর্থন অর্জনের পথে নয়, ভোটে জেতার জন্য ভোটপ্রার্থী এখন নির্ভর করেন গুণ্ডাবাহিনীর পেশীশক্তি ও প্রচারের জোরের ওপর, এর সঙ্গে থাকে কাঁচা টাকা ছড়ানোর খেলা। এর জন্য চাই অঢেল অর্থ। এই অর্থের যোগান দেয় পুঁজিপতিশ্রেণী। একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠী ও বৃহৎ শিল্পপতিরা আগে তাদের সেবাদাস রাজনৈতিক দলগুলিকে গোপনে যে অর্থ সাহায্য করত, বর্তমানে তা আর বেআইনি নয়। ফলে মসনদের লড়াইয়ে মত্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির দিকে বন্যার মত ধেয়ে আসছে টাকার স্রোত। অনেক হিসাব করেই পুঁজি মালিক ও মাফিয়া গোষ্ঠীগুলি এদের পিছনে টাকা ঢালে। যাতে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর এইসব দলের এম এল এ, এম পি'রা তাদের অর্থের যোগানদারদের অঙ্গুলি নির্দেশে চলতে বাধ্য হয়। যাতে পুঁজিপতিদের সেবার্থেই তৈরি হয় যাবতীয় আইন-কানুন — সেই চুক্তি টাকা ঢালার আগেই তারা পাকাপোক্ত করে নেয়। ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসে পুঁজিমালিকদের তল্পিবাহক এইসব দল ও সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের একমাত্র কাজ হয় পুঁজিপতিদের জন্য সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করার পথ আরো প্রশস্ত করা।

ফলে, নির্বাচন নাগরিকদের পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এই অধিকার প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষ বেছে নেবে তার প্রতিনিধিকে — এসব কথা এখন নিছকই ফাঁকা বুলি। নির্বাচন আজকের দিনে লোকঠকানো গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই অর্থবল, পেশীশক্তি ও প্রচারের শক্তির উপর নির্ভরশীল নির্বাচনে গরিব শ্রমিক-চাষী, খেতমজুর-সাধারণ মানুষের সত্যিকারের প্রতিনিধির স্থান কোথায় ? এখানে নির্বাচিত হয় শোষক পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদেরই বেছে নেওয়া প্রতিনিধিরা।

(সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ৬-২-০৪)

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের বিরুদ্ধেই ২৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশনের বিক্ষোভ

১২ ফেব্রুয়ারি রানী রাসমণি রোডে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের অনশন মঞ্চে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক বিরাট সমাবেশে সংগঠনের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক অচিন্ত্য সিন্হা বলেন, ''উভয় সরকারের বিরুদ্ধেই ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা সর্বস্তরের কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা আমরা মনে করি সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক ধর্মঘট বিরোধী রায়ের ক্ষেত্রে উভয় সরকারেরই ভূমিকা রয়েছে; উভয় সরকারই কর্ম ও কর্মীসংকোচন, অর্জিত অধিকার হরণ, বেসরকারীকরণ, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ, উপযুক্ত বেতন থেকে কর্মীদের বঞ্চিত করা, শূন্যপদে লোক নিয়োগ না করা, অফিস-দপ্তর বন্ধ করার নীতি অনুসরণ করে চলেছে।'' ফর্ম স্টোরস বন্ধের সিদ্ধান্ত, ট্রাম ও সরকারি বাস তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প ধ্বংস করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং জে পি এ'র ১০ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুর্শেদ আলি, দিলীপ দত্ত, শৈবাল চক্রবর্তী ও বিমল জানা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশনে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন জে পি এ'র নেতৃবৃন্দ।

২৪ জানুয়ারি চেন্নাইয়ের এরাডে-তে ছাত্র সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এ আই ডি এস ও'র সহ-সভাপতি কমরেড এম এন শ্রীরাম

দার্জিলিং জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সভা

গত ৩ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি হাকিম পাড়ায় ডঃ নর্মান বেথুন মেডিক্যাল সেন্টারে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি, অধ্যাপক মৃণালকান্তি ঘোষ। সভায় প্রধান বক্তা, রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি সদানন্দ বাগল তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিল করার দাবিতে গ্রাহকদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধেও গ্রাহকবৃন্দকে সচেতন হবার আহ্বান জানান। সভায় জোনাল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন, পতিতপাবন পাল, বাবু বিশ্বাস, সুনীল মণ্ডল, অরুণ রাহা, ভবেশ দাস, শঙ্কর পাল প্রমুখ।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলার কালিম্পঙে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় নেপালী সাহিত্য সভা হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কালিম্পং কলেজের অধ্যাপক অমৃত খালিং। সভায় বহু গ্রাহক তাদের উপর বিভিন্ন জুলুমের কাহিনী তুলে ধরেন এবং এস এস-এর নিকট ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বি বি গুরুং, যোগবীর শারকে, শঙ্কর পাল প্রমুখ।

ঝাড়খণ্ডে নেতাজী জয়ন্তী

গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১০৮তম জন্ম দিবস বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হল ঝাড়খণ্ডের রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সুভাষ চকে। অনুষ্ঠানের আগে ছাত্রছাত্রীদের এক সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সারা ভারত ডি এস ও আয়োজিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড মোহন সিং। তিনি বলেন, আজ যখন দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন নেতাজীর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের অনুশীলন খুবই জরুরি। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডি এস ও'র রাঁচী জেলা সভাপতি কমরেড স্বরূপ মণ্ডল।

রাঁচী জেলার মুরীতেও ডি এস ও'র উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি নেতাজী জয়ন্তী পালিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net